বাংলাদেশে এনজিওর কার্যক্রম- কিছু অভিযোগ ও পর্যালোচনা

সংকলনঃ আব্দুল মু'ক্তাদির, ঢাকা, ২২ জানুয়ারি ২০১৯

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রকাশিত তথ্য মতে **আড়াই হাজারের** অধিক নিবন্ধিত এনজিও কাজ করছে বাংলাদেশে। এর মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি কিংবা বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এনজিও। এসব এনজিও কে সাধারণত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প নির্ভর কাজ করতে দেখা যায়। উপরন্তু, ক্ষুদ্রঋন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে **প্রায় হাজার খানের সংস্থার ১৬ হাজারের অধিক শাখা** কাজ করছে সারা দেশে। নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্যমতে গত প্রায় তিন দশকে ২৬,৫৪৮ টি অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে **প্রায় ৭৬ হাজার কোটি টাকা** সমমূল্যের বিদেশি অনুদান এসেছে এনজিও গুলোতে।

তবে একই সময়ে বিভিন্ন সচেতন মহল থেকে এনজিও গুলোর বিরুদ্ধে সেবা-সাহায্যের আড়ালে অর্থনৈতিক শোষণ, গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়ন, সামাজিক ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সহ বিভিন্ন অভিযোগ উঠে এসেছে। বিশেষ করে সচেতন উলামায়ে কিরাম দীর্ঘদিন থেকেই এ বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন। বিভিন্ন সময়ে এনজিও গুলোর বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগের সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস এই লিখাটি। আলোচনার সুবিধার্থে অভিযোগগুলোকে কয়েকটি মূল পয়েন্টে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

ঋন কি তবে অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার?

ক্ষুদ্রঋণ দাতা সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ পাওয়া যায়, তার মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে লাখ লাখ মানুষকে ঋণের চক্রে আটকে ফেলা, চড়া সুদে ঋণ দেওয়া, ঋন পরিশোধে ব্যর্থদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত, হতাশা ও আত্নহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া ইত্যাদি । ২০১৬ সালে প্রকাশিত ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিনান্স এর এক পলিসি পেপারে দেখা যায়, বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋনের কার্যকর সুদের হার ক্ষেত্রভেদে **১১০% পর্যন্ত** হয়ে থাকে।

এ ছাড়াও বেশকিছু অভিযোগের কথা উঠে এসেছে চ্যানেল আই অনলাইনে ১৪ মার্চ ২০১৭ তে প্রকাশিত এক মতামত প্রতিবেদনেঃ

> *"দুএকটি ঘটনা বাদ দিলে আসলে ক্ষুদ্রঋণ এখন পুরোদস্তুর ব্যবসা, আর কিছুই নয়। আর তাই অতিমাত্রায় মুনাফা অর্জনের বিষয়টি জড়িত হওয়ার কারণেই বহু আগেই ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য বিমোচনের মূল লক্ষ্য থেকে ছিটকে গেছে। এ কারণে সুযোগ বুঝে অনেকেই এনজিও খুলে বা ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে বিত্ত*

*বৈভবের মালিকও বনে গেছেন। **ব্যাংকিং এর আদলে ক্ষুদ্রঋণ এখন একশ্রেণীর এনজিওদের সবচেয়ে ভাল ব্যবসা। এই ব্যবসা থেকে ভালো মুনাফা আসে। আর দরিদ্ররা হলো এই মুনাফার মূল যোগান দাতা।** এই ব্যবসায় এনজিওদের জন্যে কোনো ঝুঁকি নেই। ঝুঁকির সবটুকুই গ্রহীতার জন্যে। এনজিওগুলো শুধু ঋণ দেবে আর কিস্তি তুলবে। **কিস্তি দিতে না পারলে বাড়ির টেলিভিশন, জামাকাপড়, খাট-দরজা তারা নিয়ে যাবে।** নিশ্চয় মনে আছে সিডর এবং আইলার সময়ে নদী পারের আক্রান্ত মানুষগুলো যখন দিশা খুঁজে পাচ্ছিল না তখন কিস্তি তোলার জন্যে এনজিওগুলো আক্রান্ত মানুষগুলোর সাথে রীতিমতো কুৎসিত আচরণ শুরু করে। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে একজন গ্রহীতা ভালো ব্যবসা করলো কী করলো না, ঋণের টাকা দিয়ে খৎনার অনুষ্ঠান করলো কিনা সেটাও দেখার বিষয় নয়। এনজিওগুলোর দেখার বিষয় যেনো শুধু ঋণ দেওয়া আর সময়মতো কিস্তিগুলো নিয়মমাফিক তুলে আনা। এই ব্যবসার আড়ালে তাই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও বেশি ঘটছে। এর আগে এমনও ঘটনা ঘটেছিল **কিস্তি শোধ না করায় লাশ পর্যন্ত দাফন করতে দেওয়া হয়নি। নাকফুল পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়।** কেউ কেউ অবশ্য এরকম ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বলে আড়াল করার চেষ্টা করেন।"*

প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে দায়িত্বশীলদের মাঝেও যে এ ব্যাপারে উদ্বেগ রয়েছে, তার কিছুটাও ফুঁটে উঠেছে উক্ত প্রতিবেদনেঃ

"৯ মার্চ জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে ক্ষুদ্রঋণের নামে দারিদ্র লালন-পালন করা হয়েছে। আর যারা ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসা করছে, তারা ধনশালী ও সম্পদশালী হয়েছে।এ বিষয়টি যেনো গবেষণা করে দেখা হয়।"

ক্ষুদ্রঋণ দাতা সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের সম্ভবত সবচেয়ে লোমহর্ষক দিক উঠে আসে ২০১৩ সালে বিবিসির এক সরেজমিন প্রতিবেদনেঃ

*"দারিদ্রের চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এখানে (জয়পুরহাট) অনেক মানুষ ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলো থেকে ঋণ নেয়। কিন্তু এই ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে অনেকেই আরও কঠিন সমস্যায় পড়ে। ক্ষুদ্র ঋণ পরিশোধ করার জন্য অনেকে এমনকি তাদের **শরীরের অঙ্গ (কিডনি) পর্যন্ত বিক্রি করছেন**। শরীরের অঙ্গ বিক্রির ঘটনা নতুন কোন বিষয় নয়। দক্ষিণ এশিয়ায় দরিদ্র মানুষেরা অনেকদিন ধরেই এই কাজ করছেন। কিন্তু যেটা অজানা, তা হলো ক্ষুদ্র ঋণের দায় শোধ করার জন্যও এখন অনেকে শরীরের অঙ্গ বিক্রির দিকে ঝুঁকছেন।"*

উপরোক্ত ঘটনাই শেষ নয়। এরকম আরও নানা ঘটনার খবর ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন স্থানীয় নিউজ পোর্টালগুলোতে। **বিশেষ করে এনজিওর ঋণের টাকা শোধ করার চাপ সইতে না পেরে আত্নহত্যার খবরের সংখ্যাটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়ার মত।**

অর্থ আত্নসাত ও অনিয়মের অভিযোগ কতটা গুরুতর?

সাধারণত এনজিও গুলোর কার্যক্রম স্বচ্ছ ও সেবামূলক মনে করা হলেও তথ্য উপাত্ত কিছুটা ভিন্ন দিকেও ইংগিত করছে। ছোট বড় বেশ কিছু এনজিওর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে অর্থ আত্নসাত ও অনিয়মের নানা খবর। বাস্তবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন না করে ভূয়া কাগজপত্র দাখিল করা, কম খরচ করে বেশি টাকা ভাউচার করে প্রকল্পের অর্থ আত্নসাত করার মত অভিযোগও পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি অভিযোগ তুলে ধরা হলঃ

১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ ভোরের কাগজের প্রতিবেদনঃ

> *"কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে শরণার্থীদের মানবিক সেবা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে দায়িত্বরত বেশ কিছু এনজিও সংস্থা। বিনা টেন্ডারে ও গোপনে তাদের মদদপুষ্ট রোহিঙ্গা ক্যাম্পভিত্তিক ঠিকাদারের সঙ্গে আতাত করে সেবার নামে দাতা সংস্থার বরাদ্দকৃত টাকা লুটপাট হচ্ছে। অভিযোগে জানা গেছে, অর্থ লুটপাটের শীর্ষে রয়েছে এনজিও সংস্থা ব্র্যাক। চিহ্নিত ঠিকাদার সিন্ডিকেটকে কাজ পাইয়ে দিয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের* ***বেশ কয়েক জন ব্র্যাক কর্মকর্তা রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছে।*** *সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদন্ত করলে ব্র্যাকের ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতিসহ অর্থ লুটপাটের ঘটনা বেরিয়ে আসবে এমনটা মনে করেন সচেতন মহল।"*

২৫ জুন ২০১০ এ দৈনিক জনকন্ঠের প্রতিবেদনঃ

> *"****পৌনে দুই কোটি টাকার প্রকল্পে অনিয়ম****- প্রকল্পের অনতর্ভুক্ত সদস্যদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা প্রশাসন থেকে এনজিও পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেয়া হয়েছে বলে ইউএনও জানান।"*

২৬ জানুয়ারি ২০১৫ প্রথম আলোর প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপঃ

> *"১২ এনজিওর প্রকল্পে অনিয়ম-****টাকা নিয়ে লাপাত্তা; গাছ আছে কাগজে মাঠে নেই****; প্রকল্পের কাজে নানা অসংগতি"*

০১ জুলাই ২০১১ প্রথম আলোর প্রতিবেদনঃ

> *"দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির পাঁকে পড়ে দেশের অন্যতম বড় বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) হীড বাংলাদেশ মারাত্মক সংকটে। তিন হাজারের বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারী ইতিমধ্যে চাকরি হারিয়েছেন। দাতারাও সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে।* ***একাধিক তদন্তে দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রমাণ*** *পাওয়ায় সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এ জন্য দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।"*

১০ মার্চ ২০১৫ দৈনিক জনতার প্রতিবেদনঃ

*"বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত সিসিডিবি এনজিও'র সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন প্রকল্পের নাম দেখিয়ে **শত শত কোটি টাকা ব্যক্তিগতভাবে ব্যয়** করেছেন উক্ত সংস্থার সভাপতি"*

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক কিছু এনজিওর বিরুদ্ধে গ্রাহকদের সঞ্চয়ের কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করে গা-ঢাকা দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায় খবরের কাগজে।

প্রকল্পের আড়ালে খ্রিস্টবাদ প্রচার?

এনজিও কার্যক্রমের আড়ালে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খ্রিস্টবাদ প্রচারের অভিযোগ রয়েছে বেশ কয়েকটি এনজিওর বিরুদ্ধে। প্রশাসনিক তদন্ত ও তদারকি ব্যতিত এই অভিযোগের ব্যাপকতা নিশ্চিত করা কঠিন হলেও, দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন ও বেশ কিছু এনজিওর চার্চ সংশ্লিষ্টতা এমনটাই ইংগিত দেয়। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলোঃ

২০ অক্টোবর ১১ দৈনিক সংগ্রামের প্রতিবেদনঃ

"গত ২০০৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জেলা সমাজসেবা অধিদফতর থেকে মানিকগঞ্জের কান্দাপাড়া গ্রামের আমেরিকান প্রবাসী ড. লিটন সরকার হিউম্যানিটেরিয়ান এইড ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (হার্ড) নামে একটি এনজিওর নিবন্ধন নেন। ২ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি সাটুরিয়া সদর, দরগ্রাম কান্দাপাড়া ও মানিকগঞ্জে মোট ৪টি অফিস নিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শুরু করে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের কার্যক্রম। এছাড়া ঋণ দানের নামে গ্রামের সহজ সরল মুসলমান নারী-পুরুষদের মাঝে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণের প্রচার প্রচারণা শুরু করে। তাদের প্রচারনায় অনেকেই গ্রহণ করে খৃস্টান ধর্ম। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র ক্ষোভ।"

২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ দৈনিক ইনকিলাব এর প্রতিবেদনঃ

"গত দুই দশকেই পার্বত্য এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৫ হাজারে বেশি পাহাড়ি উপজাতিকে বানানো হয়েছে খ্রিস্টান। ওই এলাকার মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে মিশনারি ও তাদের প্রভাবিত এনজিওগুলো। স্বাস্থ্যসেবা ও মানবসেবার নাম করে এসব এনজিও তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এনজিওগুলোর মাধ্যমে কি পরিমাণ অর্থ ওই এলাকায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার কোন সঠিক হিসাব সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর কাছেও নেই। আর সেই সুযোগে সেবার আড়ালে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছে। স্থানীয় আইন-শৃংখলা বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, গত দেড় বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৫৪টি উপজাতি পরিবারকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এসব পরিবারের ৪৭৫ জন সদস্য এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।.......ধর্মান্তরিত করতে যেসব এনজিও কাজ করছে তার মধ্যে

রয়েছে- অ্যাডভানটেজ ক্রুশ অব বাংলাদেশ, হিউম্যানিট্রেইন ফাউন্ডেশন, খ্রিস্টান কমিশন ফর ডেভলপমেন্ট বাংলাদেশ (সিসিডিবি), ইভানজেলিক্যাল খ্রিস্টান ক্রুশ, ডানিডা, ওয়ার্ল্ড ভিশন, কৈনানিয়া, শান্তিরানী ক্যাথলিক চার্চ, গ্রিন হিল, গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (গ্রাউস), মহামনি শিশু সদন, জাইনপাড়া আশ্রম, তৈদান, আশার আলো, তৈমু প্রভৃতি সংগঠন। এনজিওগুলোর নানা প্রলোভনে পড়ে দলে দলে ধর্মান্তরিত হচ্ছে পাহাড়ি উপজাতি জনগোষ্ঠী। এছাড়াও ইউএনডিপি ও ইউনিসেফের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন রেজিস্টার্ড ও নন-রেজিস্টার্ড এনজিও' র মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকানডের আড়ালে মূলত খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার কর্মকান্ড চালানো হচ্ছে।"

এছাড়া, ১৯৯২ সালের এনজিও ব্যুরোর এক অনুসন্ধান প্রতিবেদনকে উদ্‌ধৃত করে বিভিন্ন বই ও আর্টিকেলে **৫২ টি এনজিও**র নাম পাওয়া যায়, যারা ঐ সময় ধর্মান্তরিতকরণ কাজে জড়িত ছিল।

পার্বত্য অঞ্চলে স্বাধীন খৃষ্টান রাজ্যের স্বপ্ন?

২০০১ সালে মালয়েশিয়া ভিত্তিক 'ইন্টেলেকচুয়াল ডিসকোর্স' জার্নালে প্রকাশিত একটি আর্টিকেলে দাবি করা হয়েছে, পার্বত্য অঞ্চল ঘিরে মিশনারী ও তাদের সহযোগী এনজিওদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হল একটি **স্বাধীন খৃষ্টান রাজ্যের স্বপ্ন**।

বিভিন্ন অপ্রমানিত সূত্রে জানা যায় যে, এ লক্ষ্যে প্রান্তিক উপজাতিদের ধর্মান্তরিত করণের মাধ্যমে খ্রিস্টান জনসংখ্যা বাড়ানোর পর পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনা হলো, প্রথমে পার্বত্য অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন অর্জন এবং পরের ধাপে বিশৃংখলা তৈরী করে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা। একবার বিদ্রোহ করতে পারলে পশ্চিমা প্রভাবশালী চার্চগুলোর সহায়তায় আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া হয়ত তাদের জন্য খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

দীর্ঘমেয়াদে কঠোর **গোয়েন্দা নজরদারি** ব্যাতিত এ অভিযোগের বিষয়ে সত্যতা যাচাই বাস্তবে বেশ কঠিন কাজ। তবে, পার্বত্য অঞ্চলে মিশনারীদের ক্রমবর্ধমান দৌরাত্ম এবং গত দশকে খ্রিষ্টান প্রধান দক্ষিণ সুদানের বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস সামনে রেখে এ অভিযোগকে একদম উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না বলেই মনে করেন সচেতন অনেকে।

এ ছাড়াও, বিভিন্ন এনজিওর বিরুদ্ধে দাড়ি ও হিজাবের কারণে চাকরি প্রার্থীদের প্রতি বৈষম্য করা, অশ্লীলতার প্রসার, নোংরা সমকামিতা ছড়িয়ে দিতে কাজ করা, বিনামূল্যে সহায়তার আড়ালে ওষুধ পরীক্ষার গিনিপিগ বানানো, পুরুষ বিদ্বেষ, পরিবার বিমুখতার সংস্কৃতি ছড়ানো, বেপরোয়া জন্মনিয়ন্ত্রন ও ভ্রূণ হত্যার প্রসার ইত্যাদি নানা অভিযোগ পাওয়া যায়। পর্যাপ্ত অনুসন্ধান ও তথ্য প্রমানের অভাবে বেশিরভাগ অভিযোগই সোশাল মিডিয়ার বিচ্ছিন্ন উদ্বেগ আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

তবে সামগ্রিকভাবে পারিবারগুলো টিকিয়ে রাখা, টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ও সম্ভাব্য বিদেশী সাম্রাজবাদী ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় প্রসাশনের উচ্চ পর্যায়ে কার্যকর নীতি নির্ধারণ এবং এনজিওগুলোর কার্যক্রমে যথাযথ নজরজারী ও জবাবদিহিতা বাড়ানোর প্রয়োজন যে রয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

নোটঃ *প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, এনজিও গুলোর ওয়েবসাইট, প্রকাশিত প্রকল্প তালিকা, ডোনার লিস্ট, জার্নাল আর্টিকেল, পত্রিকার প্রতিবেদন ইত্যাদির উপর নির্ভর করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রচলিত মিডিয়ায় প্রকাশিত সকল তথ্যকে নিরেট সত্য হিসেবে গ্রহণ করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। সতর্কতার দাবী হলো উপরের তথ্যগুলোকে নিরেট সত্য হিসেবে না নিয়ে সম্ভাব্য সত্য হিসেবে নেওয়া এবং যথাসম্ভব নিজ দায়িত্বে যাচাই করে নেওয়া। লেখার কলেবর যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখতে সকল তথ্য উপাত্ত উল্লেখ না করে উদাহরণস্বরুপ কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত তথ্যগুলো গুগল সার্চে সহজেই খুজে পাওয়া সম্ভব বিধায় আলাদা করে এখানে ফুটনোটে রেফারেন্স সংযুক্ত করা হলো না।*